সিডনীর মহিলা সমিতি মঞ্চে

জয়নাল আবেদীন

সামনের রাস্তায় রিক্সার সেই অতি পরিচিত টুংটাং শব্দটা ছিল না, দু'পাশের সারি সারি রিক্সার মাঝ দিয়ে হঠাৎ কোন বেবী টেক্সি বা সিএনজির ভোঁস করে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাও ছিল অনুপস্থিত, রাস্তায় দ্রুতগামী গাড়ী ছিল অনেক কিন্তু ভেঁপুর কোন উপদ্রব ছিল না, রাস্তার উল্টো দিকে সারি সারি রকমারী শাড়ীর দোকানের নিত্য-নতুন বাহারী শাড়ীর মনোহরী প্রদর্শনীটাও ছিল দৃষ্টি আকর্ষনীয় ভাবে অনুপস্থিত, রাস্তার নামটাও সেই শুভ্র-সৌম্য-সুবাসিত বেলী ফুলের কাছাকাছি বেইলী রোডের পরিবর্তে ছিল খটখটে লিভারপুল রোড, তারপরও সেই দিন সিডনীর এ্যাশফিল্ড কমিউনিটি সেন্টারের অভ্যন্তরে যে চমৎকার নাট্য প্রদর্শনী হয়ে গেল তা সার্বিক অর্থেই দর্শক শ্রোতাদের মন জগতকে নিয়ে গিয়েছিল বেইলি রোডের সেই অতি পরিচিত মহিলা সমিতি মঞ্চে। প্রথম নাটক 'মানুষ' শেষ হওয়ার পর স্বল্প বিরতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে সুমিও-দা যখন বলেন, 'এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বেইলি রোডের মহিলা সমিতির মঞ্চেই নাটক দেখছিলাম' তখন আক্ষরিক অর্থেই তার মুখ দিয়ে হলে উপস্থিত প্রায় সকল দর্শকের মনের ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়। মামুনুর রশীদের লেখা ও ফয়েজ জহিরের পরিচালনায় 'মানুষ' ও 'চে'র সাইকেল' এ অনবদ্য অভিনয় দিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখে গেলেন বাংলা থিয়েটারের নাট্য কর্মীরা।

মানুষ নাটকের একটি দৃশ্যে মামুনুর রশীদ ও তমালিকা কর্মকার

অনুষ্ঠানে আসার আগে এর সার্বিক সফলতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট । মঞ্চসজ্জা কেমন হবে, আলো কে নিয়ন্ত্রণ করবে, কতটা যথাযথ হবে, ভেবে নিশ্চিত হওয়া কষ্ট সাধ্য ছিল। 'মানুষ' নাটকের পুরো মঞ্চ সজ্জায় ছিল নৌকার একটা পাটাতন, তার উপর একটা মাস্তুলের আদল। পাটাতনের উপর একটা সাধারণ চাদর পাতা। 'চে'র সাইকেল' এর দৃশ্যপট ভিন্ন। সমুদ্র সৈকতে চিত্রিত সমস্ত ঘটনা । মঞ্চ সজ্জার জন্য ব্যবহাহৃত হয়েছে সম্ভবতঃ গাছের ভাঙা দুটো ডাল, সমুদ্র সৈকতে হঠাৎ করে গজিয়ে উঠা দুটো গাছের প্রতিকী উপস্থাপন। বসার জন্য ছিল (মনে হয়) দু'তিনটা দুধের প্লাষ্টিক কার্টেন। মঞ্চ সজ্জার জন্য আরো কিছুর প্রয়োজন ছিল বলেতো আদৌ মনে হয়নি। আলোক সম্পাদনাও নাটকের প্রয়োজন মেটাতে পারেনি বলা যাবে না। সাবলিল এবং গতিময় অভিনয়, চমৎকার উপস্থাপন আর বক্তব্যের গভীরতায় বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক যে কতটা এগিয়ে তা আবারো প্রমাণ করে দিয়ে গেল বাংলা থিয়েটার আর বাংলা নাটকের পথিকৃত মামুনুর রশীদ। সিডনীর দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে এই সুখ স্মৃতি।

চে গুয়েভারা (আর্নেস্তো গুয়েভারা ডি লা সেরনা) একাধারে একজন ডাক্তার, মার্কসিষ্ট, পলিটিশিয়ান। জন্ম আর্জেন্টিনায়, ১৪ই জুন ১৯২৮। ডাক্তারি পড়ার সময়ই লেটিন আমেরিকার প্রতন্ত অঞ্চল ঘোরার সুযোগে জনগণের দারিদ্র, দুঃখ-দুর্দশাকে খুব কাছ থেকে দেখে তাঁর দরদী মন ভারাক্রান্ত হয়। এর প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের সুপ্ত যে বীজ সেদিনই রোপিত হয়েছিল তাঁর মনের গভীরে, তাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ল্যাটিন আমেরিকার এক দেশ থেকে আর এক দেশে। ফিদেল কেস্ট্রোর প্যারামিলিটারী মুভমেন্টের সদস্য, বন্ধু ও প্রথম সারির নেতা ছিলেন। কিউবার আন্দোলনে সফল হবার পর বেশ কিছুদিন কিউবায় উচ্চতর সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে কঙ্গো ও বলিভিয়ায় রিভ্যুলিউশন ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে বলিভিয়ায় থাকা কালিন সময়ে ধরা পড়েন এবং কোন বিচার ছাড়াই তাঁকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয় (অক্টোবর ৯, ১৯৬৭) । এই নাটকে মাত্র দু'জন অভিনেতা এবং একজন অভিনেত্রীকে দিয়ে পরিচালক ফয়েজ জহির যেভাবে দশ-এগারটা চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন, তা সিডনীর দর্শকদের ভুলতে সময় লাগবে। চে গুয়েভারা গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশক, তাত্ত্বিক, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনন্য প্রতীক। দুঃখ, দূর্দশাগ্রস্হ গণমানুষের মুক্তির তিনি আগমনী গান। বাংলাদেশের দুঃস্থ জন-মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে চে'র মতো এক দরদীর আজ বড়ই প্রয়োজন। সময় উপযোগী এই জীবন ভিত্তিক নাটকের অভিনয় এবং ভিন্নধর্মী উপস্থাপন মনে রাখার মতো।

মামুনুর রশিদের নাটকের সব চরিত্রেরা জীবন থেকে উঠে আসা। এরা আমাদেরই একজন, সত্য এবং পার্থিব। কঠিন-কঠোর-সহজ সাধারণ সে সব চরিত্র। জীবনের অতি পরিচিত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আর আশার আবর্তে ছুটে চলা কতগুলো সাধারণ মানুষ। তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রেরা খোয়াব নগরে বসে খোয়াব দেখে জীবনের বৈতরণী পার করে না, চোখের আগুন দিয়ে আশে-পাশের কোন কিছুকে ভস্মিভূত করতেও তারা অক্ষম। তাদের কেউই বৃক্ষ বা পশুপাখির কথা বোঝে না, তাদের সাথে যোগাযোগ করার অলৌকিক ও দূর্লভ কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। তাঁরা বারবণিতা সন্ধ্যারাণীর মতো সাধারণ, সত্য। তারা ভবঘুরে, অনুভূতিশীল, সরল বন্ধুর মতো দূর্লভ, তবে বিরল নয় এখনো। তারা এখনো জীবনের কথা বলে, অন্যায়, অড়িগাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়। সমাজের সহজ ও সাধারণ সত্যটা নির্ভিকতায় উচ্চারণ করে 'পাগল' বলে চিহ্নিত হয়, তবু পিছপা হয় না। বারবণিতা সন্ধ্যারানীর কঠিন কঠোর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত মামুনুর রশীদের 'মানুষ' নাটকটি। সন্ধ্যারাণীর দুঃখ-কষ্ট, অবিশ্বাসের এক মানবেতর জীর্ণ জীবন বিবেকবান সরল বন্ধুর অনুপ্রবেশে নতুন করে পল্লবিত। যে সন্ধ্যারাণী এক সময় বলে, সব শিখেছি বন্ধু, শুধু মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখিনি, সেই সন্ধ্যারাণীই বন্ধুকে নিয়ে নতুন বিশ্বাসে, নতুন আশায় আবারও বুক বাঁধে

। এই আশাই-তো জীবন। আশা আছে দেখেই হয়তো মানুষ সহ্য করতে পারে সীমাহীন অসহ্যকে। অবিশ্বাসী এই কঠোর পৃথিবীতে বিশ্বাসের বাতি নিভু-নিভু হলেও নির্বাপিত হয়না হয়তো কখনোই। সন্ধ্যারাণীর প্রায় নির্বাপিত বিশ্বাসের বাতিতে বন্ধুর ভালোবাসার ছোঁয়া নতুন প্রাণের স্পন্দন জাগায়।

কঠিন জীবনের পটভুমিতে লেখা এই নাটকের গতি চমৎকার, অভিনয় প্রশংসনীয়। অপরিচিত না হলে ও অনভ্যস্ততায় কোন কোন সংলাপ গলধঃকরণ কষ্টসাধ্য হলেও নাটকের অব কাঠামোয় অতি সহজেই উত্তীর্ণ। শেষ অঙ্কে সন্ধ্যারাণীর দূর্ঘটনা কবলিত মৃত্যু অত্যন্ত স্পর্ষকাতর এবং নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত। শেষ অঙ্কের এই বিয়োগান্ত দৃশ্য শেলীর বিখ্যাত কবিতা The Cloud এর সেই অতি পরিচিত চরণ আবারও নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought' মনে হয় সত্যিই যথার্থ। নাটকের এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পরেও মনের কোণায় কোথায় যেন একটা খটকা লেগেই আছে। কেন যেন সার্বক্ষণিকই মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সন্ধ্যারাণীর মতো মানুষদের সভ্য সমাজে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, তাই অত্যন্ত সহজ ও সরল পথটাকেই নাট্যকারকে বেছে নিতে হয়েছে। অতি যত্নের সাথে সন্ধ্যারাণীকে খুন করা হয়েছে। এটাই হয়তো সামাজিক কাম্য, চরম বাস্তব। কিন্তু মামুনুর রশিদের মতো আলোকিত মনের মানুষেরা যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন ও নিয়ম ভাঙার প্রেরণা না যোগায় তবে কার দিকে তাকিয়ে থাকবে অনাগত সমাজ? শত-সহস্র সন্ধ্যারাণীর অবিশ্বাস আর সীমাহীন অসহ্যের জীবনে সন্ধ্যা প্রদীপের মতো একটুকরো আশার আলো জ্বালিয়ে রাখা, বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাবে কে? - - - - - - - - - - - - - - -

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ৭ সেপ্ট: ২০০৬, ইমেইল # jabedin@aapt.net.au

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]